#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

16th to 20th Mar 2026

সূচক

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** ____ **01**
   - 1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা ____ 01
     - 1.1.1. NCERT পাঠ্যবই নিষিদ্ধকরণ: বিচার বিভাগীয় দায়বদ্ধতা ও বাক-স্বাধীনতার পরীক্ষা ____ 01
   - 1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ____ 04
     - 1.2.1. হরমোজ প্রণালী (STRAIT OF HORMUZ) সংকট ____ 04
   - 1.3. সামাজিক ন্যায়বিচার ____ 09
     - 1.3.1. ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি ব্যবস্থা: কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের পথ ____ 09

2. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** ____ **13**
   - 2.1. পরিবেশ ____ 13
     - 2.1.1. ভারতে জলকেন্দ্রিক জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা ____ 13

3. **বিবিধ** ____ **18**
   - 3.1. পত্র – ১ (প্রবন্ধ) ____ 18
     - 3.1.1. রক্ত, আচার এবং পুনর্জন্ম: লালের অদৃশ্য ভাষা ____ 18

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. NCERT পাঠ্যবই নিষিদ্ধকরণ: বিচার বিভাগীয় দায়বদ্ধতা ও বাক-স্বাধীনতার পরীক্ষা

ভূমিকা

যেকোনো গণতন্ত্রে বিচার বিভাগকে **স্বাধীনতা** (Independence) এবং **দায়বদ্ধতার** (Accountability) মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। ভারতে বিচার বিভাগ সাধারণত **'আদালত অবমাননা'** (Contempt of Court) ক্ষমতার মাধ্যমে তার মর্যাদা রক্ষা করে। তবে ম্যাক বুট (Max Boot)-এর মতো পণ্ডিতরা তাঁর *'Out of Order' (১৯৯৮)* গ্রন্থে যুক্তি দিয়েছেন যে, বিচার বিভাগের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জনসচেতনতা থাকলেই কেবল বিচার ব্যবস্থায় প্রকৃত সংস্কার সম্ভব।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একটি NCERT পাঠ্যবই নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। বিচার বিভাগের এই **'সেন্সর'** (Censor) হিসেবে ভূমিকা পালন করা গণতন্ত্রে স্বচ্ছতা ও **বাক-স্বাধীনতা** (Freedom of Expression) নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে।

পটভূমি: NCERT পাঠ্যবই বিতর্ক (The Controversy)

NCERT-এর অষ্টম শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে **"আমাদের সমাজে বিচার বিভাগের ভূমিকা"** শীর্ষক একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের বিচার বিভাগের শক্তি এবং বাস্তব চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে শিক্ষিত করা।

ক. বিতর্কের মূল বিষয়বস্তু (Key Content)

আদালত যে বিষয়গুলোর ওপর আপত্তি জানিয়েছে:

- **বিচারিক বিলম্ব** (Judicial Delay): তথ্য অনুসারে ২০২৫ সালের শেষে সুপ্রিম কোর্টে **৯২,০০০** এবং দেশজুড়ে মোট **৪.৭৬ কোটির** বেশি মামলা ঝুলে আছে। এখানে **"বিলম্বে বিচার মানেই বিচারহীনতা"** নীতিটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- **বিচার বিভাগীয় দুর্নীতি** (Judicial Corruption): বইটিতে নিম্ন ও উচ্চ আদালতে দুর্নীতির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।
- **ব্যাঙ্গালোর বিচার বিভাগীয় আচরণবিধি** (Bangalore Principles): বিচারকদের সততা, নিরপেক্ষতা এবং চারিত্রিক গুণাবলি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের উল্লেখ।
- **দায়বদ্ধতা প্রক্রিয়া** (Accountability Mechanisms): সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব **'ইন-হাউস প্রসিডিউর'** (In-house Procedure) এবং সংবিধানের **১২৪ ও ২১৭ অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী বিচারকদের অপসারণের (Impeachment) পদ্ধতির আলোচনা।

খ. সুপ্রিম কোর্টের ত্রি-স্তরীয় রায় (The SC Ruling)

ভারতের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন:

১. **পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞা** (Complete Blanket Ban): পাঠ্যবইটির বিতরণ এবং শিক্ষাদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

২. **"অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য"** (Underlying Agenda): আদালত পর্যবেক্ষণ করেন যে, এই বিষয়বস্তু বিচার বিভাগের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্য একটি একপেশে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টা।

৩. **প্রশাসনিক শাস্তি** (Administrative Punishment): সংশ্লিষ্ট লেখক ও বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যতে যেকোনো সরকারি বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজেক্ট থেকে **অব্যাহতি** (Disassociated) বা কালো তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আদালতের পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি

সমালোচিত হলেও, **প্রতিষ্ঠানিক সুরক্ষা** (Institutional Preservation) নিশ্চিত করতে আদালতের এই হস্তক্ষেপকে নিম্নোক্তভাবে সমর্থন করা হয়েছে:

- **জনআস্থা বজায় রাখা:** বিচারবিভাগের শক্তি জনবিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে **নেতিবাচক ধারণা** তৈরি হলে দীর্ঘমেয়াদে **আইনের শাসনের** (Rule of Law) বৈধতা সংকটে পড়তে পারে।
- **ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা নিশ্চিত করা:** আদালতের মতে, পাঠ্যবইটি ছিল **একপেশে** (Selective)। এটি ই-কোর্ট (e-Courts), আইনি সহায়তা (Legal Aid) এবং ন্যাশনাল জুডিশিয়াল ডেটা গ্রিডের (NJDG) মতো **রূপান্তরমূলক সংস্কারগুলোকে** এড়িয়ে গেছে।
- **অনুচ্ছেদ ১২৯ (অবমাননার জন্য শাস্তি):** সুপ্রিম কোর্ট একটি **'কোর্ট অফ রেকর্ড'** (Court of Record) হিসেবে তার মর্যাদা ও কর্তৃত্ব রক্ষা করার সহজাত ক্ষমতার অধিকারী।
- **ভুল তথ্য রোধ:** সমর্থকদের মতে, **শিক্ষায় স্বাধীনতা** (Academic Freedom) মানে এই নয় যে অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে সংবিধানের তৃতীয় স্তম্ভের (বিচারবিভাগ) প্রতি অনাস্থা তৈরি করা যাবে।

পাঠ্যবই নিষিদ্ধকরণ নিয়ে প্রধান উদ্বেগ

এই নিষেধাজ্ঞা ভারতীয় সংবিধান এবং আইনি নীতির লঙ্ঘনের বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে:

- **বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার লঙ্ঘন:** সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(অ)** অনুযায়ী শিক্ষামূলক উপাদান প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত।
    - **অনুচ্ছেদ ১৯(২)** অনুযায়ী শুধুমাত্র রাষ্ট্রের তৈরি করা কোনো **আইনের** মাধ্যমেই এই অধিকার সংকুচিত করা সম্ভব।
    - **নরেশ শ্রীধর মিরাজকর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৬৬)** মামলা অনুযায়ী, আদালতের কোনো আদেশ অনুচ্ছেদ ১৯(২)-এর অধীনে 'আইন' হিসেবে গণ্য হয় না।
- **আদালত অবমাননার শর্ত পূরণ না হওয়া: আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১** (Section 2c) অনুযায়ী, অপরাধমূলক অবমাননার জন্য আদালতের কর্তৃত্বকে কলঙ্কিত করা বা বিচার প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া প্রয়োজন।
    - মামলার দীর্ঘসূত্রতা বা দুর্নীতির মতো সাধারণ ও তথ্যভিত্তিক আলোচনার ক্ষেত্রে আদালতের কোনো **ক্ষতি বা অসৎ উদ্দেশ্য** (Malicious Intent) প্রমাণিত হয়নি।
- **প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার ও আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন:** লেখক ও কর্মকর্তাদের ভবিষ্যতের প্রজেক্ট থেকে **বিচ্ছিন্ন** (Blacklisted) করার শাস্তিমূলক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:
    - কোনো প্রকার **নোটিশ বা শুনানির সুযোগ** (Natural Justice/Audi Alteram Partem) ছাড়াই।
    - এটি সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ১৪ (সাম্য)** এবং **অনুচ্ছেদ ২১ (জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার)** লঙ্ঘন করে।
- **বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার স্ববিরোধিতা ও প্রতিকারের অভাব:** আদালত হলো মৌলিক অধিকারের চূড়ান্ত রক্ষক। যখন আদালত নিজেই বাকস্বাধীনতা খর্ব করে:
    - নাগরিকদের কাছে কোনো **প্রতিকারের পথ** (Remedy) থাকে না, কারণ বিচারবিভাগের উপরে কোনো উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নেই।
    - এটি এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে **অধিকারের রক্ষকই অধিকার হরণকারীর** ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর প্রভাব এবং বিচারবিভাগীয় দায়বদ্ধতা

১. ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর প্রভাব

- **জনআস্থার ক্ষয় (Erosion of Public Trust):** আলোচনার পথ রুদ্ধ করলে এমন বার্তা যায় যে বিচারবিভাগ **তদন্ত বা পর্যালোচনার ঊর্ধ্বে**, যা এর নৈতিক কর্তৃত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- **মুক্তচিন্তা ও শিক্ষার ওপর নেতিবাচক প্রভাব (Chilling Effect):** লেখক, প্রকাশক এবং শিক্ষকরা যে কোনো সমালোচনামূলক বিষয় এড়িয়ে চলতে পারেন, যা তরুণ নাগরিকদের মধ্যে **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে** দুর্বল করে।
- **ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণে ঝুঁকি (Threat to Separation of Powers):** যখন কোনো একটি বিভাগ নিজের সম্পর্কে বিতর্ক স্তব্ধ করে দেয়, তখন সমস্ত প্রতিষ্ঠানের **জবাবদিহিতা** দুর্বল হয়ে পড়ে।
- **দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি:** শিক্ষার্থীরা ভারসাম্যপূর্ণ **নাগরিক শিক্ষা (Civic Education)** লাভের সুযোগ হারায়, যা সচেতন নাগরিকত্ব গঠনের পথে অন্তরায়।

বিচারবিভাগীয় দায়বদ্ধতায় বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন

উন্নত গণতন্ত্রগুলি গোপনীয়তার বদলে **উন্মুক্ততার** মাধ্যমে বিচারবিভাগের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করে:

- **কেনিয়ার মডেল (২০১১-২০১৩):** প্রধান বিচারপতি উইলি মুতুঙ্গা **জুডিশিয়াল ওমবাডসম্যান (Judicial Ombudspersons)** এবং পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করেছিলেন। সমস্যাগুলি প্রকাশ্যে স্বীকার করার ফলে জনআস্থা ২০০৯ সালের ২৭% থেকে বেড়ে ২০১৩ সালে **৬১%** হয়েছিল।
- **আমেরিকা ও ব্রিটেন:** সেখানে সংবাদমাধ্যম এবং শিক্ষাবিদরা অবাধে বিচারবিভাগের কর্মক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করেন। আদালত সমালোচনা নিষিদ্ধ করার বদলে **স্বচ্ছতা (Transparency)** বৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দেয়।

ভারতের নিজস্ব বিচারবিভাগীয় অবস্থান

ভারতীয় আদালত নিজেই অতীতে বিভিন্ন সমস্যা স্বীকার করেছে:

- **কে. বীরাস্বামী বনাম ভারত সরকার (১৯৯১):** সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা **দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের** অধীনে 'public servant' বা জনসেবক হিসেবে গণ্য হবেন।
- **সততার দাবি:** আদালত জোর দিয়ে বলেছিল যে বিচারকের সততার বিষয়ে সমাজের দাবি **অপেক্ষাতীত ও পরম (Absolute)**। এমনকি একজন অসৎ বিচারকও পুরো বিচারব্যবস্থার **অখণ্ডতাকে (Integrity)** বিপন্ন করতে পারেন।
- **স্বীকৃতি বনাম নিষেধাজ্ঞা:** সুপ্রিম কোর্ট নিজেই বারবার 'bad apples' (অসৎ বিচারক), মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং **ইন-হাউস মেকানিজমের** প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সতর্ক করেছে; অথচ একই কথা বলা একটি বই নিষিদ্ধ করেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কৌশলগত রোডম্যাপ

শাসনব্যবস্থায় দমনমূলক সংস্কৃতির বদলে **স্বচ্ছতা ও ক্ষমতায়ন** আনতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি প্রয়োজন:

ক. দায়বদ্ধতাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া (Formalizing Accountability)

- **বিচারবিভাগীয় স্বচ্ছতা:** জাতীয় বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (NJAC) পুনরুজ্জীবিত করা বা **জুডিশিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি বিল** পাস করা, যাতে অভিযোগগুলি একটি বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।
- **যোগ্যতা-ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন:** কলেজগুলির স্বাধীনতাকে NIRF র‍্যাঙ্কিং এবং NBA স্বীকৃতির সাথে যুক্ত করা। যেসব কলেজ গুণমান প্রমাণ করবে, তাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে **একাডেমিক ও আর্থিক স্বাধীনতা** দেওয়া উচিত।

খ. নিষেধাজ্ঞার চেয়ে কাঠামোগত সমাধানে গুরুত্ব (Structural Fixes)

- **শূন্যপদ পূরণ:** হাইকোর্টগুলিতে **৩০% শূন্যপদ** এবং কলেজগুলিতে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা। পাঠ্যবইয়ে সমস্যার কথা সেন্সর করার চেয়ে **মামলার জট (Pendency)** কমানো অনেক বেশি কার্যকর।

- **প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ:** বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 'আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রক' থেকে **'একাডেমিক মেন্টর'** বা পরামর্শদাতার ভূমিকায় আসতে হবে।

গ. প্রাতিষ্ঠানিক সংযম (Institutional Restraint)

- **'শেষ অস্ত্র' নীতি:** আদালত অবমাননা বা সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার ক্ষমতা কেবল তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন তা **একান্ত অনিবার্য**।
- **স্ক্রুটিনি বা পর্যালোচনার নীতি: লর্ড অ্যাটকিন (Lord Atkin)**-এর মতানুসারে, প্রতিষ্ঠানগুলি কোনো 'নিভৃত গুণ' (cloistered virtues) নয়। প্রকৃত উন্নয়নের জন্য তাদের **জনসাধারণের পর্যালোচনার** মুখোমুখি হওয়ার মতো শক্তিশালী হতে হবে।

ঘ. পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ (NCERT Model)

- **সমস্যা-সমাধান ভিত্তিক শিক্ষাদান:** চ্যালেঞ্জগুলো গোপন না করে পাঠ্যবইয়ে সততার সাথে **কাঠামোগত বাধা** (যেমন: মামলার জট) এবং তার **আধুনিক সমাধান** (যেমন: এআই-চালিত কোর্ট, লোক আদালত) তুলে ধরতে হবে।

উপসংহার

এনসিইআরটি পাঠ্যবই নিষিদ্ধ করার বিষয়টি কেবল একটি বই নিয়ে নয়—এটি ২০২৬ সালে **ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি অগ্নিপরীক্ষা**। বিচারবিভাগের মর্যাদা রক্ষা করা অপরিহার্য হলেও, প্রকৃত মর্যাদা আসে **স্বচ্ছতা (Transparency)** থেকে, নীরবতা থেকে নয়। লেখক কালেশ্বরম রাজ এবং তুলসী কে. রাজের ভাষায়— **"পদ্ধতিগত সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রথম ধাপ হলো সেগুলিকে স্বীকার করা।"**

একটি বিচারবিভাগ যা ক্রমাগত নিজেকে সংশোধন করে এবং নাগরিকদের নিজের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে শিক্ষিত করে, সেটিই আমাদের সংবিধানের **শক্তিশালী স্তম্ভ** হয়ে থাকবে। একমাত্র উন্মুক্ততা এবং দায়বদ্ধতার মাধ্যমেই জন আস্থা পুনরায় গড়ে তোলা সম্ভব এবং গণতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থে শক্তিশালী করা সম্ভব।

Q. "Suppressing criticism weakens institutions more than it protects them." Evaluate this statement in the context of the judiciary.

1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

1.2.1. হরমোজ প্রণালী (STRAIT OF HORMUZ) সংকট

ভূমিকা

সহজ কথায়, **হরমোজ প্রণালী** হলো একটি সরু সামুদ্রিক পথ যা বিশ্বের মোট বাণিজ্য হওয়া তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বহন করে। সাম্প্রতিক **মার্কিন-ইসরায়েল** সামরিক অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় **ইরান** এই পথ দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে তেলের দাম প্রতি ব্যারেল **১১০ ডলার** ছাড়িয়ে গেছে এবং ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মতো দেশগুলো তাদের কৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে।

বিশ্ব জ্বালানি প্রবাহে হরমোজ প্রণালীর গুরুত্ব

হরমোজ প্রণালী হলো ইরান (উত্তরে) এবং ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের (দক্ষিণে) মধ্যে অবস্থিত একটি সংকীর্ণ জলপথ। এটি **পারস্য উপসাগরকে** (সৌদি আরব, ইরাক, কুয়েত ও ইরানের মতো তেল উৎপাদনকারী দেশ) **ওমান উপসাগর** এবং **আরব সাগরের** সাথে যুক্ত করে।

মূল তথ্যসমূহ:

- **ভৌগোলিক অবস্থান:** এর সংকীর্ণতম অংশ মাত্র **২১–৩৩ কিমি** চওড়া।
- **পরিবহন ক্ষমতা:** প্রতিদিন প্রায় **২০–২১ মিলিয়ন ব্যারেল** অপরিশোধিত তেল এখান দিয়ে যায় (বিশ্বের সামুদ্রিক তেল বাণিজ্যের প্রায় ২০-২৫%)।
- **এলএনজি (LNG):** বিশ্বের মোট এলএনজি সরবরাহের প্রায় **২০%** এই পথেই পরিবাহিত হয়।
- **এশিয়ার উপর নির্ভরতা:** এখান দিয়ে যাওয়া তেলের **৮০–৯০%** যায় চীন, **ভারত**, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায়।
- **বিকল্প ব্যবস্থা:** সৌদি আরবের ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইনের মতো বিকল্পগুলো বড়জোর ৩.৫–৭ মিলিয়ন ব্যারেল বহন করতে পারে, যা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত সামান্য।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ: এটি একটি বৈশ্বিক **"চোকপয়েন্ট"** (Chokepoint)। এখানে সামান্য বাধা সৃষ্টি হলেও বিশ্বজুড়ে সরবরাহ ঘাটতি, আতঙ্ক এবং তেলের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে এই পথ বন্ধ হওয়ায় শত শত ট্যাঙ্কার আটকে আছে এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর রপ্তানি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশ্বের জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারের সমীকরণ

বিশ্বের মোট জ্বালানির অর্ধেকেরও বেশি (IEA ২০২৪-এর তথ্য অনুযায়ী) আসে **খনিজ তেল** এবং **প্রাকৃতিক গ্যাস** থেকে। বাকি অংশ আসে কয়লা, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং পারমাণবিক উৎস থেকে।

প্রধান ব্যবহারসমূহ:

- **পরিবহন জ্বালানি:** গাড়ি, ট্রাক, উড়োজাহাজ ও জাহাজের জ্বালানি হিসেবে।
- **বিদ্যুৎ উৎপাদন:** বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য।
- **রান্নার গ্যাস (LPG):** গৃহস্থালির জ্বালানি হিসেবে।
- **শিল্পের কাঁচামাল:** প্লাস্টিক, রাসায়নিক এবং সার কারখানার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে।

উৎপাদন ও ব্যবহারের ধরন

- **প্রধান উৎপাদক:** মূলত **পশ্চিম এশিয়ার** পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ঘনীভূত; বিশেষ করে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, ইরাক এবং কুয়েত। এরা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তেল ও গ্যাস রপ্তানিকারক।
- **প্রধান ভোক্তা:** পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিসমূহ, বিশেষ করে **চীন, ভারত ও জাপান**।
- **সীমিত অভ্যন্তরীণ মজুদ:** এই এশীয় দেশগুলোর নিজস্ব তেলের মজুদ খুবই সামান্য (যদিও চীন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন করে)।

আমদানির ওপর ব্যাপক নির্ভরতা

- **নির্ভরশীলতা:** চীন, ভারত এবং জাপান তাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি ও জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে আমদানিকৃত খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর **প্রবলভাবে নির্ভরশীল**।

- **হরমোজ প্রণালীর গুরুত্ব:** এই আমদানির একটি বিশাল অংশ পারস্য উপসাগর থেকে **হরমোজ প্রণালীর** মধ্য দিয়ে আসে। ফলে এই **'চোকপয়েন্ট'**টি বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সারকথা: পশ্চিম এশিয়ায় বিপুল **উৎপাদন** এবং এশিয়ায় বিশাল **চাহিদা**—এই দুইয়ের মধ্যে এক স্পষ্ট অসামঞ্জস্য রয়েছে। যা হরমোজ প্রণালীর নিরাপদ চলাচলের ওপর বিশ্বকে চরমভাবে নির্ভরশীল করে তুলেছে।

বিশ্ব তৈল বাজারের প্রধান পক্ষসমূহ

বিশ্বের খনিজ তেলের মজুদ এবং উৎপাদনের সিংহভাগ কেবল কয়েকটি অঞ্চল ও দেশের নিয়ন্ত্রণে:

১. OPEC **(অর্গানাইজেশন অফ দ্য পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ)**

- **ভূমিকা:** বিশ্ববাজারে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ স্থিতিশীল রাখতে **উৎপাদন মাত্রা** সমন্বয় করে।
- **সদস্য:** ১২-১৩টি প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশ নিয়ে গঠিত।
- **নেতৃত্ব:** সৌদি আরব (প্রধান নেতা), সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, ইরাক, কুয়েত ইত্যাদি।
- **ক্ষমতা:** ওপেক দেশগুলোর কাছে বিশ্বের **৭০%-এর বেশি** তেলের মজুদ রয়েছে। তারা উৎপাদন কমানো বা বাড়ানোর মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে।

পশ্চিম এশিয়া (পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহ)

- **প্রধান উৎপাদক:** সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE), ইরান, ইরাক এবং কুয়েত।
- **গুরুত্ব:** এই অঞ্চলটি বিশ্ব তেলের মজুদের একটি বিশাল অংশ ধারণ করে এবং **হরমোজ প্রণালীর** মাধ্যমে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করে।
- **প্রভাব:** এখানকার অধিকাংশ দেশ OPEC-এর সদস্য, যা বিশ্ব বাজারে তেলের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে তাদের শক্তিশালী ভূমিকা দেয়।

২. **অন্যান্য কৌশলগত পক্ষ**

- **ভেনেজুয়েলা ও ইরান:** এই দুই দেশের কাছে সম্মিলিতভাবে বিশ্বের বিশাল পরিমাণ মজুদ (**~৩৯%**) রয়েছে।
- **ভেনেজুয়েলা:** এককভাবে বিশ্বের প্রায় **১৭%** তেলের মজুদ এই দেশটির কাছে।
- **সীমাবদ্ধতা:** বিশাল মজুদ থাকা সত্ত্বেও **নিষেধাজ্ঞা** (Sanctions) এবং **অবকাঠামোগত দুর্বলতার** কারণে বর্তমানে তাদের উৎপাদন সীমিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং ভারতের মধ্যে পরিবর্তিত ক্ষমতা সমীকরণ

১. **জ্বালানি ভূ-রাজনীতিতে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ভূমিকা**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানির একাধারে **প্রধান উৎপাদক এবং ভোক্তা:**

- মার্কিন অর্থনীতি উচ্চ-জ্বালানি নির্ভর (পরিবহন, শিল্প), ফলে তাদের মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহার ভারতের তুলনায় প্রায় **১০ গুণ** বেশি।
- **ঐতিহাসিক পরিবর্তন:** ১৯৫০-এর দশকে পশ্চিম এশিয়ার তেলের নিয়ন্ত্রণ মার্কিন/ইউরোপীয় কোম্পানি থেকে স্থানীয় **রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানিতে** চলে যায়। ১৯৭০-এর দশকে OPEC তেলকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার শুরু করে।
- **মার্কিন কৌশল:**

১. **অভ্যন্তরীণ উৎপাদন:** ২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে **শেল অয়েল** (Shale Oil) এবং **ফ্র্যাকিং** (Fracking) প্রযুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা বিশ্বের বৃহত্তম তেল উৎপাদক হয়ে ওঠে।

২. **সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ:** জ্বালানি রুট এবং উপসাগরীয় তেলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে আমেরিকা বিভিন্ন সময় উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০), ইরাক যুদ্ধ (২০০৩), এবং বর্তমানের ইরান-ইসরায়েল সংঘাতে জড়িয়েছে।

- **ভবিষ্যৎ সমীকরণ:** ইরান ও ভেনেজুয়েলার কাছে বিশ্বের প্রায় **৩৯%** তেলের মজুদ থাকায় আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় এই দেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ। তবে হরমোজ প্রণালী বন্ধ হওয়ায় রাশিয়া বর্তমানে বৈশ্বিক বাজারে এক প্রধান স্থিতিশীল শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

২. সুবিধাজনক অবস্থানে রাশিয়ার উত্থান

- ২০২২ সালের ইউক্রেন যুদ্ধের পর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়া কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল।
- বর্তমানে পশ্চিম এশিয়ার তেল সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায়, রাশিয়ার তেল বিশ্বের জন্য **অপরিহার্য** হয়ে উঠেছে। পশ্চিম এশিয়ার বাইরে রাশিয়ার কাছেই সবচেয়ে বেশি রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত তেল রয়েছে।

ক. রুশ তেল এবং ভারতের ভূমিকা

- ভারত বিশ্বের **দ্বিতীয় বৃহত্তম** অপরিশোধিত তেল আমদানিকারক এবং **তৃতীয় বৃহত্তম** ভোক্তা।
- বাজারে তেলের জোগান কমলে ভারতে জ্বালানি, পরিবহন এবং নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়। তাই ভারতের ক্রয়ের সিদ্ধান্ত বিশ্ববাজারে বড় প্রভাব ফেলে।

খ. ইউরোপের জ্বালানি সংকট

- নিজস্ব মজুদ কম থাকায় ইউরোপ শীতকালে ঘর গরম রাখার জন্য ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল। ২০২২-এর নিষেধাজ্ঞার পর তারা পশ্চিম এশিয়ার দিকে ঝুঁকেছিল, যা এখন সংকটে।

গ. রাশিয়ার দিকে ভারতের ঝোঁক

- সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি নিশ্চিত করতে ভারত ডিসকাউন্টে রুশ তেল কেনা বাড়িয়েছে।
- **আমদানির হার:** ২০২১ সালে ভারতের মোট আমদানির মাত্র **২.৫%** ছিল রুশ তেল, যা ২০২৩ সালে বেড়ে প্রায় **৩৯%** হয় (২০২৫-এ যা প্রায় ৩৩%)।
- **পরিশোধন ও মুনাফা:** ভারত সস্তা রুশ তেল আমদানি করে তা পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজিতে রূপান্তর করছে। ভারতের বিশাল **রিফাইনিং ক্ষমতা** থাকায় তারা এই পরিশোধিত পণ্য রপ্তানি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করছে।

হরমোজ প্রণালী সংকটে পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিক্রিয়া

- **নীরব সমর্থন:** প্রকাশ্যে সমালোচনা করলেও, পশ্চিমা নেতারা ভারতের রুশ তেল কেনার বিষয়টিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। কারণ ২০২২ সাল থেকে ভারতের এই পদক্ষেপ বিশ্ববাজারে তেলের দাম স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করেছে।
- **বর্তমান চাপ:** হরমোজ প্রণালী বন্ধ হওয়ায় এবং তেলের দাম **১১০ ডলার** ছাড়িয়ে যাওয়ায়, বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে আমেরিকা এখন জরুরিভিত্তিতে **রাশিয়ার আটকে থাকা তেলের** সরবরাহ বাড়ানোর পক্ষে মত দিচ্ছে।

জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় ভারতের বহুমুখী পদক্ষেপ

১. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন (ECA), ১৯৫৫-এর অধীনে সরকারি নিয়ন্ত্রণ

- সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে **অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫**-এর আওতায় **প্রাকৃতিক গ্যাস (সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ২০২৬** জারি করেছে।
- **অগ্রাধিকার ভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা:**
  - **শীর্ষ অগ্রাধিকার:** রান্নার গ্যাস (PNG), পরিবহন (CNG) এবং LPG উৎপাদন।
  - **সরবরাহ হ্রাস:** সার কারখানা (প্রায় ৭০%) এবং অন্যান্য শিল্পখাত (প্রায় ৮০%)।

- **মজুদদারি রোধ:** আতঙ্কিত ক্রয় ও কালোবাজারি রুখতে দুটি LPG বুকিংয়ের মাঝে **২৫ দিনের ব্যবধান** বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২. **জ্বালানি আমদানির বহুমুখীকরণ**

- ভারত হরমোজ প্রণালীর মতো ঝুঁকিপূর্ণ পথের ওপর নির্ভরতা কমাচ্ছে।
- **বিকল্প উৎস:** আলজেরিয়া, নরওয়ে, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি বাড়ানো হয়েছে।
- **নিরাপদ রুট:** সরবরাহ সচল রাখতে দীর্ঘ পথ হওয়া সত্ত্বেও **কেপ অফ গুড হোপ** (Cape of Good Hope) রুট ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩. **রুশ তেলের ওপর বর্ধিত নির্ভরতা**

- পশ্চিম এশিয়া থেকে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় ভারত **রাশিয়া** থেকে তেল আমদানি আরও বাড়িয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো সাময়িকভাবে **নিষেধাজ্ঞা শিথিল** করায় ভারতের পক্ষে এই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

৪. **অভ্যন্তরীণ জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি**

- সরকার রিফাইনারিগুলোকে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, বিশেষ করে LPG বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে।
- **ফলাফল:** স্বল্পমেয়াদে LPG উৎপাদন প্রায় **১০% বৃদ্ধি** পেয়েছে।
- এই বাড়তি উৎপাদন মূলত সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বণ্টন করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি

১. **ভারতের জন্য: জ্বালানি নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ**

- **আমদানির বহুমুখীকরণ:** একক পথের ওপর নির্ভরতা কমাতে রাশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং আফ্রিকা থেকে তেল আমদানির উৎস বাড়াতে হবে।
- **কৌশলগত তেল মজুদ (SPR):** বর্তমানে মাত্র ২ সপ্তাহের মজুদ সক্ষমতাকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী **৯০ দিনে** উন্নীত করতে হবে।
- **সবুজ জ্বালানি:** জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে **সৌর, বায়ু শক্তি** এবং **বৈদ্যুতিক যানবাহনের** (EV) প্রসারে গতি আনতে হবে।
- **পরিশোধন সক্ষমতা:** বিভিন্ন ধরণের অপরিশোধিত তেল পরিশোধনের সক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়াতে হবে।

২. **যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার জন্য: বৈশ্বিক সরবরাহ স্থিতিশীল করা**

- **যুক্তরাষ্ট্র:** হরমোজ প্রণালীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পথগুলো সচল রাখতে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানো এবং বৈশ্বিক সরবরাহ চাপ কমাতে অভ্যন্তরীণ **শেল অয়েল** উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- **রাশিয়া:** উদ্বৃত্ত উৎপাদক দেশ হিসেবে ভারতসহ আমদানিকারক দেশগুলোকে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে স্থিতিশীল তেল সরবরাহ করে বিশ্ববাজারে ভরসা জোগানো।

৩. **বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য: পদ্ধতিগত স্থিতিশীলতা**

- **বিকল্প পথ:** ঝুঁকিপূর্ণ 'চোকপয়েন্ট'-এর ওপর নির্ভরতা কমাতে পাইপলাইন এবং নতুন LNG **টার্মিনাল** তৈরিতে বিনিয়োগ করা।
- **আন্তর্জাতিক সমন্বয়:** তেলের দামের অস্বাভাবিক ওঠানামা রোধে OPEC+-এর মতো মঞ্চে উৎপাদক দেশগুলোর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা।
- **নবায়নযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর:** IEA-র পরামর্শ অনুযায়ী দ্রুত পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দিকে এগিয়ে যাওয়া।

- **কূটনীতি:** স্থিতিশীল বাণিজ্যের স্বার্থে বিরোধ নিষ্পত্তিতে গুরুত্ব দেওয়া।

উপসংহার

হরমোজ প্রণালীর সংকট প্রমাণ করে যে **জ্বালানি নিরাপত্তা** এবং **ভূ-রাজনীতি** একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িত। একটিমাত্র জলপথ বন্ধ হওয়া বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। ভবিষ্যতে একটি স্থিতিশীল জ্বালানি ব্যবস্থার জন্য আমদানির বহুমুখীকরণ, অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কোনও বিকল্প নেই।

Q. Discuss how geopolitical conflicts in West Asia influence global energy flows and reshape power dynamics among major countries like the U.S., Russia, and India.

1.3. সামাজিক ন্যায়বিচার

1.3.1. ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি ব্যবস্থা: কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের পথ

ভূমিকা

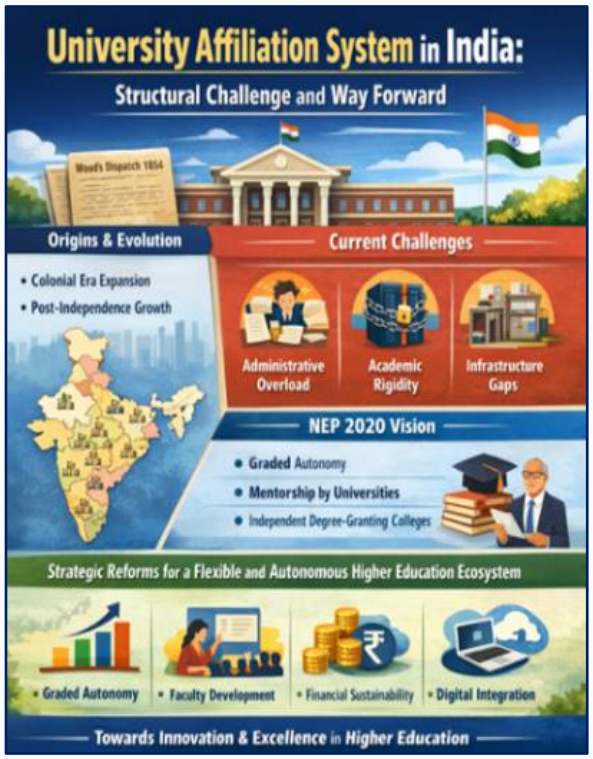

জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রায়শই উপেক্ষিত দিক হলো এর **নতুন নিয়ন্ত্রক কাঠামো**। এই নীতি আগামী **১৫ বছরের মধ্যে** পর্যায়ক্রমে অধিভুক্তি ব্যবস্থা (Affiliation system) বিলুপ্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এর পরিবর্তে **গ্রেডেড স্বায়ত্তশাসন (Graded Autonomy)** প্রদান করে কলেজগুলোকে স্বাধীনভাবে ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার কথা বলা হয়েছে, যাতে শিক্ষার গুণমান, নমনীয়তা এবং উদ্ভাবন বৃদ্ধি পায়।

প্রথাগত এই **মডেলটি একসময় প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা দিলেও,** বর্তমানে এটি কলেজগুলোর প্রবৃদ্ধি এবং স্বকীয়তাকে বাধাগ্রস্ত করছে। এই ব্যবস্থাটি বর্তমানে **পদ্ধতিগত অদক্ষতা, প্রাচীন একাডেমিক কঠোরতা** এবং **প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জের** ভারে জর্জরিত।

অধিভুক্তি ব্যবস্থার বিবর্তন ও যৌক্তিকতা

ভারতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি ব্যবস্থার শিকড় রয়েছে ঔপনিবেশিক যুগে, বিশেষ করে **১৮৫৪ সালের উড'স ডেসপ্যাচ (Wood's Dispatch)**-এর পর। একে ভারতের ইংরেজি শিক্ষার **"ম্যাগনা কার্টা"** বলা হয়।

ক. ঔপনিবেশিক ভিত্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক নকশা:

- **উড'স ডেসপ্যাচ** প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে (কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেছিল।
- এটি তৎকালীন **লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের** অনুকরণে 'অধিভুক্তি মডেল' গ্রহণ করে, যা তখন মূলত একটি পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থা ছিল।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মূলত **পরীক্ষা গ্রহণ এবং অধিভুক্তি প্রদানকারী সংস্থা** হিসেবে দেখা হতো, শিক্ষকতা বা গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে নয়।
- **উদ্দেশ্য:** একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা এবং শিক্ষার মানদণ্ড তৈরি করা।

খ. স্বাধীনতা-পরবর্তী বিস্তার:

১৯৪৭ সালের পর জনশিক্ষার প্রসারের জন্য এই ব্যবস্থাটি বজায় রাখা হয়। এর মাধ্যমে সরকার দ্রুত উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয়। একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের **"ব্র্যান্ড নেম"** এবং একটি নির্দিষ্ট **সিলেবাস** ব্যবহার করে শত শত ছোট বা গ্রামীণ কলেজকে ডিগ্রি প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয়, ফলে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার আওতায় আসে।

অধিভুক্তি মডেলের মূল উদ্দেশ্যসমূহ (Core Objectives)

- **শিক্ষার প্রসার (Expansion of Access):** পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করেই দ্রুত অসংখ্য কলেজ খোলার সুযোগ প্রদান।
- **অভিন্নতা ও মানকীকরণ (Uniformity and Standardisation):** একটি সাধারণ পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং একাডেমিক মানদণ্ড নিশ্চিত করা।
- **প্রশাসনিক দক্ষতা:** বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় ভূখণ্ডে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

অধিভুক্তি ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো (Present Structure)

বর্তমানে বিশেষ করে **রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো (State Universities)** শত শত কলেজের সাথে যুক্ত। এদের প্রধান দায়িত্বগুলো হলো:

- **পরীক্ষা পরিচালনা** এবং **ডিগ্রি প্রদান**।
- **পাঠ্যক্রম প্রণয়ন** এবং সংশোধন।
- শিক্ষক এবং অবকাঠামোগত **মান নিয়ন্ত্রণ**।
- একাডেমিক এবং প্রশাসনিক **তদারকি**।

বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি **বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (UGC)** নির্দেশিকা অনুযায়ী কলেজগুলিকে অধিভুক্তি প্রদান করে। এই অধিভুক্তির মূল উদ্দেশ্যগুলি হলো:

- প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে **একাডেমিক মান (Academic standards)** বজায় রাখা।
- **অভিন্ন পাঠ্যক্রম (Uniform curriculum)** এবং **প্রমিত পরীক্ষা ব্যবস্থা (Standardised examinations)** নিশ্চিত করা।
- **অবকাঠামো (Infrastructure)**, শিক্ষকের গুণমান এবং প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করা।

অধিভুক্তি প্রক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **অস্থায়ী এবং সময়াবদ্ধ:** অধিভুক্তি কোনো স্থায়ী অনুমোদন নয়। এটি সাধারণত শুরুর দিকে **এক বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে** দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর (১-৩ বছর) নবায়ন করতে হয়।
- **কঠোর আনুগত্য আবশ্যিক:** অধিভুক্ত কলেজগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশাবলী মেনে চলতে হয়, যার মধ্যে রয়েছে:
    - প্রশাসনিক নির্দেশিকা এবং প্রবিধান।
    - নির্ধারিত **সিলেবাস (Syllabi)** এবং কোর্সের কাঠামো।
    - **পরীক্ষার ধরন (Examination patterns)** এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি।
    - ভর্তি, উপস্থিতি এবং **ফি কাঠামো (Fee structure)** সংক্রান্ত নিয়ম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় তদারকি

অধিভুক্তকারী বিশ্ববিদ্যালয় তার অধীনস্থ কলেজগুলোর ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে, যেমন:

- পাঠ্যক্রম তৈরি ও আধুনিকীকরণ।

- **কেন্দ্রীভূত মূল্যায়ন** (Centralised evaluation) এবং পরীক্ষা পরিচালনা।
- UGC এবং বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি পালিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা।
- একাডেমিক গুণমান এবং **শিক্ষক নিয়োগ** (Faculty appointments) তদারকি করা।

এই ব্যবস্থার ফলে একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শত শত কলেজ এবং লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী চলে আসে, যা একটি **অত্যধিক কেন্দ্রীভূত এবং আমলাতান্ত্রিক কাঠামো** (Centralised and bureaucratic structure) তৈরি করে।

মানসম্মত শিক্ষার পথে কাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ

বর্তমান ব্যবস্থাকে "মানসম্মত গুণমানহীন কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ" হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যা বেশ কিছু গুরুতর **চ্যালেঞ্জসমূহ** তৈরি করে:

১. **বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অতিরিক্ত প্রশাসনিক চাপ**

- **আমলাতান্ত্রিক জট** (Bureaucratic Congestion)**:** বড় বড় রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায় ৮০০ থেকে ১,০০০টি কলেজ পরিচালনা করে। ফলে তারা গবেষণার চেয়ে **পরীক্ষা পরিচালনা** এবং ফলাফল প্রকাশে বেশি ব্যস্ত থাকে।
- **গবেষণায় ব্যাঘাত:** সম্পদের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেবল 'প্রশাসনিক সচিবালয়' হিসেবে কাজ করে। ফলে **উদ্ভাবন** (Innovation) এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মতো মূল কাজগুলো অবহেলিত হয়।
- **পরিসংখ্যান:** AISHE ২০২১-২২ রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৪৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটির অধীনে ১০০-এর বেশি কলেজ রয়েছে। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানের মতো রাজ্যে এই চাপ প্রবল।

২. **একাডেমিক কঠোরতা এবং উদ্ভাবনে বাধা**

- **পাঠ্যক্রমিক স্বায়ত্তশাসনের অভাব** (Lack of Curricular Autonomy)**:** কলেজগুলো আইনত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস মানতে বাধ্য। ফলে তারা স্থানীয় শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক কোর্স (যেমন- AI বা Fintech) ডিজাইন করতে পারে না।
- **সৃজনশীলতায় বাধা:** এই "এক মাপে সবার জন্য" (One-size-fits-all) মডেলটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়।

৩. **পাঠ্যক্রম সংস্কারে স্থবিরতা**

- **সিলেবাস আপডেট করতে দেরি:** শত শত কলেজের জন্য সিলেবাস পরিবর্তন করতে দীর্ঘ সময় লাগে। ফলে যখন কোনো সংস্কার কার্যকর হয়, ততক্ষণে সেই বিষয়বস্তু **অপ্রাসঙ্গিক বা সেকেলে** (Obsolete) হয়ে যায়।
- **তৎপরতার অভাব** (Agility Deficit)**:** একবিংশ শতাব্দীর দ্রুত পরিবর্তনশীল কর্মক্ষেত্রের চাহিদার সাথে এই ধীরগতির মডেলটি মানিয়ে নিতে পারে না।

৪. **অবকাঠামো এবং গুণমানের বৈষম্য**

- **অসম পরিষেবা:** একই সিলেবাস থাকা সত্ত্বেও ল্যাবরেটরি সুবিধা বা শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের পার্থক্যের কারণে শিক্ষার প্রকৃত গুণমান ব্যাপকভাবে ভিন্ন হয়।
- **দক্ষতার ঘাটতি** (Skill Competency Gaps)**:** একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীদের দক্ষতার মান আলাদা হয়, যা ওই **ডিগ্রির গ্রহণযোগ্যতাকে** (Credibility) কমিয়ে দেয়।

NEP ২০২০-এর সংস্কার লক্ষ্য

জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) **২০২০** একটি আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছে:

- **পরামর্শদাতা** (Mentors)**:** বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিভুক্ত কলেজগুলোর জন্য মেন্টর বা পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করবে।
- **ন্যূনতম মানদণ্ড** (Minimum Benchmarks)**:** কলেজগুলোকে একাডেমিক, পাঠদান, শাসন ব্যবস্থা (Governance), অর্থায়ন এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মানদণ্ড অর্জন করতে হবে।

- **গ্রেডেড স্বায়ত্তশাসন** (Graded Autonomy): পর্যায়ক্রমিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে কলেজগুলো ধীরে ধীরে **স্বীকৃতি** (Accreditation) লাভ করবে এবং স্বনির্ভর **স্বায়ত্তশাসিত ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে** রূপান্তরিত হবে।
- **পর্যায়ক্রমে বিলুপ্তি:** আগামী **১৫ বছরের মধ্যে** এই অধিভুক্তি ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ বা 'ফেজ আউট' করা হবে।

বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন

বিশ্বের অনেক উন্নত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা কঠোর অধিভুক্তি মডেল থেকে সরে এসে **প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন** (Institutional Autonomy) এবং শক্তিশালী গুণমান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকেছে:

- **যুক্তরাষ্ট্র:** এখানকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত স্বাধীন এবং আঞ্চলিক সংস্থা দ্বারা স্বীকৃত। কোনো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় শত শত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে না। এই স্বকীয়তা দ্রুত **উদ্ভাবন** (Innovation) এবং শিল্পের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করে।
- **যুক্তরাজ্য:** সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা ও পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। গুণমান বজায় রাখা হয় Teaching Excellence Framework (TEF)-এর মতো বাহ্যিক কাঠামোর মাধ্যমে, আমলাতান্ত্রিক তদারকির মাধ্যমে নয়।
- **জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়া:** এখানে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার ওপর জোর দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা এবং শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর মনোনিবেশ করে এবং বাজারের চাহিদায়ে দ্রুত সাড়া দেয়।

উত্তরণের পথ: গুণমান, সাম্য এবং নমনীয়তা বৃদ্ধির সংস্কার

নীতির উদ্দেশ্য এবং বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান দূর করতে একটি বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন:

১. **গ্রেডেড স্বায়ত্তশাসনে রূপান্তর:** এই প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ হতে হবে। NIRF র‍্যাঙ্কিং এবং NAAC অ্যাক্রেডিটেশন স্কোরকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে কলেজগুলোকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

২. **শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি** (Capacity Building): কলেজগুলোকে স্বনির্ভর করতে শিক্ষকদের **পাঠ্যক্রম প্রণয়ন** (Curriculum design) এবং অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পদ্ধতিতে দক্ষ করে তুলতে হবে।

৩. **আর্থিক দৃঢ়তা** (Financial Robustness): সরকার এবং মূল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কলেজগুলোর জন্য একটি টেকসই আর্থিক মডেল তৈরিতে সহায়তা করতে হবে, যা কেবল ছাত্রছাত্রীদের ফি-এর ওপর নির্ভরশীল নয়।

৪. **ডিজিটাল একীকরণ: একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট** (ABC)-এর সঠিক ব্যবহার শিক্ষার্থীদের গতিশীলতা বাড়াবে এবং স্বায়ত্তশাসিত কলেজগুলোকে তাদের বিশেষায়িত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার সুযোগ দেবে।

উপসংহার

বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্তি ব্যবস্থা একসময় শিক্ষার প্রসারের হাতিয়ার থাকলেও, বিশেষায়িত শিক্ষার এই যুগে এটি একটি **প্রতিবন্ধক** (Bottleneck) হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে স্বায়ত্তশাসন, নমনীয়তা এবং উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার ওপর। এই ব্যবস্থার বিলুপ্তি কেবল একটি নিয়ন্ত্রক পরিবর্তন নয়; বরং এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে **বিশ্বজুড়ে প্রতিযোগিতামূলক** (Globally competitive) করে গড়ে তোলার এবং ভারতীয় যুবসমাজকে আধুনিক ও উচ্চমানের দক্ষতায় সজ্জিত করার একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ।

Q. The university affiliation system, once a tool for expansion of higher education, has now become a constraint on quality and innovation." Critically examine in the light of the National Education Policy (NEP) 2020.

***

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

2.1. পরিবেশ

2.1.1. ভারতে জলকেন্দ্রিক জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা

প্রেক্ষিত

- ২০২৫ সালের নভেম্বরে ব্রাজিলের বেলেমে অনুষ্ঠিত COP 30 সম্মেলনে, জলবায়ু অভিযোজনের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এখানে জলকে অভিযোজন কৌশলের মূল স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- UAE Framework for Global Climate Resilience-এর অধীনে বৈশ্বিক অভিযোজন সূচকগুলি জল, স্যানিটেশন এবং হাইজিন (WASH) ব্যবস্থাকে জলবায়ু অভিযোজন কৌশলের কেন্দ্রে রেখেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন যেভাবে জল ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে

জলবায়ু পরিবর্তন জলচক্রের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে একটি **"হুমকি বৃদ্ধিকারক"** (Threat Multiplier) হিসেবে কাজ করে।

- **চরম আবহাওয়ার তীব্রতা (বন্যা-খরা কূটাভাস):** তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে জলচক্র তীব্র হয়; **প্রতি ১°C বৃদ্ধিতে বাতাস প্রায় ৭% বেশি আর্দ্রতা ধারণ করতে পারে**। ফলে স্বল্প সময়ে অতিবৃষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদী শুষ্ক স্পেল দেখা যায়।
  - এর ফলে একইসাথে শহরে বন্যা এবং গ্রামে খরা সৃষ্টি হয়। কংক্রিটে ঢাকা শহর বৃষ্টির জল শোষণ করতে পারে না, যা বন্যা পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তোলে।
  - **উদাহরণ:** ২০২৩ সালের উত্তর ভারতের বন্যা এবং চেন্নাইয়ের বারবার ঘটে যাওয়া বন্যা এর প্রমাণ। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্রের মারাঠওয়াদার মতো অঞ্চলগুলি অনিয়মিত বর্ষার কারণে ফসলের ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
- **হিমালয়ের হিমবাহের অস্থিতিশীলতা ("তৃতীয় মেরু" সংকট):** হিমালয় গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং সিন্ধুর মতো বারোমাসি নদী ব্যবস্থার উৎস।
  - উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহ দ্রুত গলছে। শুরুতে এটি নদীর প্রবাহ এবং বন্যার ঝুঁকি বাড়ালেও, দীর্ঘমেয়াদে এটি প্রাকৃতিক **"জল ব্যাংক"** খালি করে দিচ্ছে, যা নদীগুলোর বারোমাসি চরিত্রকে হুমকির মুখে ফেলছে। এছাড়া হিমবাহ হ্রদ বিস্ফোরণজনিত বন্যার (GLOFs) ঝুঁকিও বাড়ছে।
  - **উদাহরণ:** ২০২৩ সালে সিকিমের দক্ষিণ লহোনাক হ্রদ বিস্ফোরণে তিস্তা-III জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
- **উপকূলীয় ঝুঁকি এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ:** সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে নোনা জল মিষ্টি জলের স্তরে (aquifers) ঢুকে পড়ে, যা **লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ** (Saline Intrusion) নামে পরিচিত। এটি পানীয় ও সেচের জলকে দূষিত করে এবং মাটির লবণাক্ততা বাড়িয়ে কৃষির উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়।
  - **উদাহরণ: সুন্দরবনে** সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কৃষকরা ধান চাষ ছেড়ে লবণ-সহিষ্ণু ফসল বা চিংড়ি চাষে বাধ্য হচ্ছেন, যা মাটির গুণমান আরও নষ্ট করছে।
- **কৃষি চাপ এবং জল-খাদ্য-জলবায়ু নেক্সাস:** কৃষি জলের উপর নির্ভরশীল এবং এটি জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার ও কারণ উভয়ই। প্রথাগত ধান চাষ বৈশ্বিক মিথেন নির্গমনের ১০-১৫% জন্য দায়ী।

- ভারতের ৫০% নিট চাষযোগ্য জমি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল, ফলে বর্ষার সময় পরিবর্তনের কারণে খাদ্য নিরাপত্তা ও মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি বাড়ছে (যেমন- ২০২৪ সালের তাপপ্রবাহ ও অকাল বৃষ্টিতে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় গমের ফলন হ্রাস)।

- **জল-শক্তি ফিডব্যাক লুপ:** ভূপৃষ্ঠের জল কমে গেলে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ে, যার জন্য প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়।
  - এই বিদ্যুৎ মূলত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আসে, যা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বাড়িয়ে জলবায়ু পরিবর্তনকে আরও তীব্র করে।
  - **উদাহরণ: তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানায়** ভূগর্ভস্থ জলের স্তর **৩০০-৫০০ মিটার** নিচে নেমে যাওয়ায় কৃষি বিদ্যুতের ব্যবহার বহুগুণ বেড়েছে।

বেলেম অভিযোজন সূচক

৫৯টি বেলেম অভিযোজন সূচক, যা UAE Framework for Global Climate Resilience-এর অধীনে গৃহীত হয়েছে, জলনিরাপত্তার সংজ্ঞাকে পুনর্নির্ধারণ করেছে। এটি কেবল পরিকাঠামো বা **'সম্পদ সৃষ্টি'** (Asset Creation) নয়, বরং জলবায়ু সংকটের সময় জল ব্যবস্থার **'কার্যকরী নির্ভরযোগ্যতা'** (Functional Reliability) নিশ্চিত করার ওপর জোর দেয়। এটি দুটি প্রধান স্তরে বিভক্ত:

- **স্তর ১ - জলবায়ু-সহনশীল WASH ব্যবস্থা:** জলবায়ু-প্ররোচিত জলের অভাব হ্রাস এবং বন্যা ও খরা মোকাবিলায় সক্ষমতা তৈরি করা। এর লক্ষ্য হলো পরিকাঠামোকে এমনভাবে উন্নত করা যাতে চরম আবহাওয়ার সময়ও **নিরাপদ পানীয় জলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ** বজায় থাকে।
- **স্তর ২ - প্রো-অ্যাক্টিভ রিস্ক গভর্নেন্স:** এটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব দেয়। এর লক্ষ্য ২০২৭ সালের মধ্যে সর্বজনীন **মাল্টি-হ্যাজার্ড আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম** চালু করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিটি দেশের **জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন** (Vulnerability Assessments) আপডেট করা।

জলকেন্দ্রিক জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব

জল হলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অনুভব করার প্রধান মাধ্যম, যা পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এবং মানব অস্তিত্বের মধ্যে **'কানেক্টিভ টিস্যু'** হিসেবে কাজ করে। শহরের জলাশয়গুলো কেবল সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ **ব্লু-গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার** (BGI)।

ব্লু-গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার (BGI)-এর সংজ্ঞা: এটি মূলত প্রাকৃতিক ও আধা-প্রাকৃতিক এলাকার একটি পরিকল্পিত নেটওয়ার্ক।

- **'ব্লু' (Blue):** নদী, হ্রদ এবং জলাভূমি।
- **'গ্রিন' (Green):** পার্ক, গাছপালা এবং উদ্যান। এর মূল লক্ষ্য হলো **'রিজেনারেটিভ আরবানজম'** (প্রকৃতিকে জলচক্র ব্যবস্থাপনার সুযোগ দেওয়া যাতে বৃষ্টির জল ড্রেন দিয়ে বের না করে সেখানেই শোষণ ও সঞ্চয় করা যায়)।
- **জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান বার্তাবাহক:** জলবায়ু পরিবর্তন মূলত জলচক্রের চরম অবস্থার একটি **'ত্রয়ী'** (Trilemma) হিসেবে প্রকাশ পায়: অতিবৃষ্টি (বন্যা), অনাবৃষ্টি (খরা) এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধি।
- **বন্যা প্রশমন ও বাফারিং:** জলাভূমিগুলো **'প্রাকৃতিক স্পঞ্জ'** হিসেবে কাজ করে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল শোষণ করে। চেন্নাই ও মুম্বাইয়ের বন্যা বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে জলাশয় ভরাটের কারণেই সেখানে বন্যার প্রকোপ বেড়েছে।
- **ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জ:** কংক্রিটে ঢাকা শহরে জলাশয়গুলোই হলো বৃষ্টির জল মাটির নিচে পৌঁছানোর প্রধান পথ। **বেঙ্গালুরুতে** জলাশয় কমে যাওয়ায় ২০ বছরে জলের স্তর ২৮ মিটার থেকে ৩০০ মিটারের নিচে নেমে গেছে।
- **তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ:** বাষ্পীভবনের মাধ্যমে জলাশয়গুলো শহরের তাপমাত্রা কমিয়ে **'আরবান হিট আইল্যান্ড'** (UHI) প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে।

- **প্রাকৃতিক জল পরিশোধন:** জলাভূমিগুলো শহরের **'প্রাকৃতিক কিডনি'** হিসেবে কাজ করে দূষক ও বর্জ্য ফিল্টার করে। **পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (EKW)** প্রতিদিন কোনো খরচ ছাড়াই ৯০০ মিলিয়ন লিটার বর্জ্য জল পরিশোধন করে।
- **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** জলাশয়গুলো শহরের ধূসর ধূসর পরিবেশের মধ্যে জীববৈচিত্র্যের হটস্পট হিসেবে কাজ করে। হায়দ্রাবাদের **নেকনমপুর হ্রদ 'ফ্লোটিং ট্রিটমেন্ট ওয়েটল্যান্ড'** ব্যবহার করে পাখির আবাসস্থল ফিরিয়ে এনেছে।

জলকেন্দ্রিক জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

২০৩৫ সালের মধ্যে ভারতের শহুরে জনসংখ্যা **৬৭ কোটি ৫০ লক্ষ** ছুঁয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে ২০২৩ সালের **জলাশয় শুমারি (Waterbody Census)** অনুযায়ী, ভারতের ২৪ লক্ষ জলাশয়ের মাত্র **২.৯%** শহরে অবস্থিত, যার একটি বড় অংশ দূষণ ও জবরদখলের কারণে বর্তমানে অব্যবহৃত।

১. **পদ্ধতিগত অভাব এবং পরিকাঠামোর দুর্বলতা:** ভারতের জল পরিকাঠামো মূলত গড় আবহাওয়ার ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা চরম জলবায়ু পরিস্থিতির জন্য **"স্ট্রেস-টেস্ট"** (Stress-tested) করা হয়নি।

- **মূল সমস্যা:** মনোযোগ কেবল সংযোগ বাড়ানোর ওপর, কিন্তু জরুরি অবস্থার জন্য **উৎসের বৈচিত্র্যকরণ** এবং **সিস্টেম রিডানড্যান্সি** (বিকল্প ব্যবস্থা) নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।

২. **অনিশ্চিত এবং ভঙ্গুর অভিযোজন অর্থায়ন:** ২০৩৫ সালের মধ্যে বার্ষিক **১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের** বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও প্রকৃত অর্থায়ন অনিশ্চিত। জল প্রকল্পগুলোকে প্রায়ই **"সেক্টরাল কস্ট"** (সাধারণ খরচ) হিসেবে দেখা হয়, উচ্চ-মূল্যের **"জলবায়ু বিনিয়োগ"** হিসেবে নয়।

- **মূল সমস্যা:** পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে শহরগুলো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বদলে কেবল **দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের** (Reactive) ওপর মনোনিবেশ করে।

৩. **মানবকেন্দ্রিক বনাম পরিবেশকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব:** অনেক পুনরুদ্ধার প্রকল্প পরিবেশগত পুনরুদ্ধারের চেয়ে **কসমেটিক বিউটিফিকেশন** (যেমন গ্রানাইটের জগিং ট্র্যাক বা ফোয়ারা) ওপর জোর দেয়। এই ধরণের হস্তক্ষেপ জলাশয়ের **হাইড্রোলজিক্যাল ফাংশন** (জল শোধন বা ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জ করার ক্ষমতা) নষ্ট করে দেয়।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক বিভাজন (Silos):** জল শাসনের দায়িত্ব বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে বিভক্ত। যেমন—রাজস্ব বিভাগ জমির মালিক, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গুণমান তদারকি করে এবং পুরসভা জল সরবরাহ নিশ্চিত করে।

- **মূল সমস্যা:** এই সমন্বয়হীনতা **"ইমপ্লিমেন্টেশন প্যারালাইসিস"** সৃষ্টি করে, যেখানে এক বিভাগের প্রচেষ্টা অন্য বিভাগের সিদ্ধান্তের কারণে ব্যর্থ হয়।

৫. **ডিজিটাল ব্যবধান এবং খণ্ডিত তথ্য:** ভারতের প্রচুর হাইড্রোলজিক্যাল তথ্য থাকলেও তা বিভিন্ন বিভাগে খণ্ডিত অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় পরিকল্পনায় **AI-চালিত রিয়েল-টাইম তথ্যের** সমন্বয় খুবই নগণ্য।

- **মূল সমস্যা:** তথ্যের সঠিক আদান-প্রদান না থাকায় শহর পরিচালকরা দ্রুত ও তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

বৈশ্বিক সেরা অনুশীলন

কেস স্টাডি	অবস্থান	মূল উদ্ভাবন/মডেল
জাক্কুর লেক	বেঙ্গালুরু	**ইন্টিগ্রেটেড মডেল:** জল শোধনের জন্য স্যুয়ারেজ প্ল্যান্টের সাথে প্রাকৃতিক জলাভূমির সমন্বয়।
পূর্ব কলকাতা জলাভূমি	পশ্চিমবঙ্গ	**"প্রাকৃতিক কিডনি":** প্রতিদিন ৯০০ মিলিয়ন লিটার বর্জ্য জল শোধন করে এবং মৎস্য চাষে সহায়তা করে।
নেকনমপুর লেক	হায়দ্রাবাদ	**NbS মডেল:** পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ দিয়ে তৈরি 'ফ্লোটিং ট্রিটমেন্ট ওয়েটল্যান্ড' ব্যবহার।

চেওংইয়েচিওন	সিউল, দ. কোরিয়া	**গ্রিনওয়ে মডেল:** একটি হাইওয়ে সরিয়ে ঢাকা পড়ে থাকা নদী পুনরুদ্ধার; এটি তাপমাত্রা ৩-৫°C কমিয়ে দিয়েছে।
সিঙ্গাপুর/চীন-		**স্পঞ্জ সিটি মডেল:** বৃষ্টির জল শোষণের জন্য প্রাকৃতিক নদী এবং ফ্লাডপ্লেন ব্যবহার।

জলকেন্দ্রিক স্থিতিস্থাপকতার জন্য প্রধান সরকারি উদ্যোগসমূহ

- **সমন্বিত জল শাসন:** বিভিন্ন জল-সম্পর্কিত বিভাগগুলোকে একীভূত করতে **জল শক্তি মন্ত্রক** (Ministry of Jal Shakti) গঠন করা হয়েছে, যা জল সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে।
- **ভূগর্ভস্থ জল ব্যবস্থাপনা: ন্যাশনাল অ্যাকুইফার ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জলস্তরের (Aquifers) মানচিত্র তৈরি এবং ভূগর্ভস্থ জলের টেকসই ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেয়।
- **পানীয় জল নিরাপত্তা: জল জীবন মিশন** (Jal Jeevan Mission) প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে কার্যকরী ট্যাপ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জলের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
- **নদী পুনরুজ্জীবন: ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা** (NMCG) গঙ্গা অববাহিকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ এবং বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধারে কাজ করে।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা: জলীয় স্থিতিস্থাপকতার জন্য একটি পুনরুজ্জীবনমূলক রোডম্যাপ

১. **নীতির অভিসরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক একীকরণ** (Policy Convergence): নতুন কোনো মিশন তৈরির বদলে বর্তমান মিশনগুলোকে (যেমন- **জল জীবন**, AMRUT 2.0, **স্মার্ট সিটি**) **বেলেম সূচকগুলোর** (Belém Indicators) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।
   - **প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি:** ২০১৯ সালে **জল শক্তি মন্ত্রক** গঠনের মাধ্যমে ভারত ইতিমধ্যেই সমন্বিত ব্যবস্থাপনার ভিত্তি তৈরি করেছে।
   - **মূল পদক্ষেপ:** মিশন ড্যাশবোর্ডগুলোতে **'ক্লাইমেট স্ট্রেস মেট্রিক্স'** অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে চরম আবহাওয়ায় পরিকাঠামোর কার্যকারিতা পরিমাপ করা যায়।

২. **সমন্বিত হাইড্রোলজিক্যাল পরিকল্পনা** (Integrated Hydrological Planning): শহরগুলোকে জলাশয়কে কেবল একটি 'সম্পদ' বা রিয়েল এস্টেট হিসেবে দেখা বন্ধ করতে হবে। **লেক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান** (LMPs)-কে আইনিভাবে **সিটি মাস্টার প্ল্যান**-এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
   - **মূল পদক্ষেপ:** NAQUIM 2.0-এর তথ্য ব্যবহার করে কেবল মানচিত্র তৈরি নয়, বরং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ নিশ্চিত করা। জলাশয়ের পুরো **ক্যাচমেন্ট এরিয়া** (জল সংগ্রহের এলাকা) এবং ইনলেট ড্রেনগুলো রক্ষা করা জরুরি।

৩. **"স্পঞ্জ সিটি"** (Sponge City) **কাঠামোর গ্রহণ:** শহুরে নকশাকে জল 'নিষ্কাশন' করার বদলে জল 'শোষণ' করার দিকে চালিত করতে হবে। শহরগুলোকে একটি স্পঞ্জের মতো নকশা করতে হবে যা বৃষ্টির জল শোষণ, সঞ্চয় এবং পরিশোধন করতে পারে।
   - **মূল পদক্ষেপ:** বৃষ্টির জল সরাসরি ড্রেনে না পাঠিয়ে তা মাটিতে রিচার্জ করার জন্য **নেচার-বেসড সলিউশন** (NbS) যেমন- পারমিবল পেভমেন্ট এবং রেইন গার্ডেন ব্যবহার করা।

৪. **চক্রাকার জল অর্থনীতি:** জলের ব্যবহারকে 'রৈখিক' (ব্যবহার ও ফেলে দেওয়া) থেকে **'চক্রাকার'** (হ্রাস-পুনঃব্যবহার-পুনশ্চক্রায়ন) মডেলে নিয়ে আসতে হবে। শোধিত বর্জ্য জলকে আবর্জনা না ভেবে জলাশয় পুনরুজ্জীবনের সম্পদ হিসেবে দেখতে হবে।
   - **মূল পদক্ষেপ:** ভূগর্ভস্থ জলের ওপর চাপ কমাতে শিল্পকারখানা এবং কুলিং সিস্টেমে **শোধিত বর্জ্য জলের পুনঃব্যবহার** বাধ্যতামূলক করা।

৫. **পরিকাঠামোর ক্লাইমেট স্ট্রেস-টেস্টিং:** বাঁধ, পাইপ এবং ড্রেন সহ সমস্ত জল পরিকাঠামোকে চরম আবহাওয়ার পরিস্থিতির জন্য **'স্ট্রেস-টেস্ট'** করতে হবে।

- **মূল পদক্ষেপ:** ঐতিহাসিক গড় বৃষ্টিপাতের তথ্যের ওপর নির্ভর না করে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় **"১০০ বছরে একবার ঘটা"** (1-in-100-year) বন্যার মতো চরম পরিস্থিতি সামলানোর উপযোগী নকশা নিশ্চিত করা।

৬. **ডিজিটাল পরিকাঠামো ও AI-এর সমন্বয়:** ভারতের প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এমন **ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম** তৈরি করতে হবে যা সেন্সর এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে।

- **মূল পদক্ষেপ: আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স** (AI) ব্যবহার করে রিয়েল-টাইম আবহাওয়ার পূর্বাভাসের সাথে শহরের জল ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার সরাসরি সংযোগ ঘটানো।

৭. **গোষ্ঠীগত তদারকি ও সাধারণ সম্পদের সুরক্ষা:** স্থিতিস্থাপকতা তখনই সফল হয় যখন তা অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়। স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে একটি **তদারকি মডেলে** (Stewardship Model) নিয়ে যেতে হবে যা প্রথাগত ব্যবহারকারীদের অধিকার রক্ষা করে।

- **মূল পদক্ষেপ: মহল্লা সমিতি** এবং স্থানীয় এনজিওগুলোকে (যেমন- বেঙ্গালুরুর PNLIT) ক্ষমতায়ন করা, যাতে মৎস্যজীবী এবং কৃষকরা জলাশয়গুলোকে তাদের অভিন্ন ঐতিহ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তন মূলত একটি জলীয় চ্যালেঞ্জ, কারণ জলচক্রের বিঘ্ন বন্যা, খরা এবং জল নিরাপত্তাহীনতাকে বাড়িয়ে তোলে। কেবল সম্পদ সৃষ্টির বদলে পদ্ধতিগত স্থিতিস্থাপকতার ওপর জোর দিয়ে এবং অভ্যন্তরীণ মিশনগুলোকে **বেলেম সূচকের** সাথে সমন্বয় করে ভারত গ্লোবাল সাউথের জন্য একটি অনুকরণীয় মডেল তৈরি করতে পারে, যা Water Vision 2047-এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

Q. জলবায়ু পরিবর্তন মূলত একটি জল সংকট। জলচক্রের বিঘ্ন কীভাবে ভারতে আর্থ-সামাজিক দুর্বলতা বাড়িয়ে তুলছে তা পরীক্ষা করুন।

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

বিবিধ

3.1. পত্র – ১ (প্রবন্ধ)

3.1.1. রক্ত, আচার এবং পুনর্জন্ম: লালের অদৃশ্য ভাষা

ভূমিকা: সমাজের অদৃশ্য ভিত্তি হিসেবে প্রতীক

মানব সভ্যতাকে সাধারণত রাষ্ট্র, অর্থনীতি এবং আইনের মতো দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বোঝা হয়। কিন্তু এই কাঠামোগুলোর নিচে রয়েছে এক গভীর ও **অদৃশ্য ভিত্তি** (Invisible foundation): প্রতীক। রং, আচার-অনুষ্ঠান, পৌরাণিক কাহিনী এবং রূপকগুলো নীরবে মানুষের **চেতনা** (Consciousness) এবং **যৌথ আচরণকে** (Collective behavior) রূপ দেয়। দার্শনিক আর্নস্ট ক্যাসিরারের মতে, 'মানুষ কেবল এক যুক্তিবাদী প্রাণী নয়, বরং সে একটি **প্রতীকী প্রাণী** (Symbolic animal)।'

সমস্ত প্রতীকের মধ্যে, 'লাল' বর্ণটি বিভিন্ন সংস্কৃতিতে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রতীক হিসেবে স্বতন্ত্র। এটি জীবন ও মৃত্যু, ত্যাগ ও নবায়নের মধ্যবর্তী সন্ধিক্ষণকে চিহ্নিত করে—যাকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় একটি **প্রান্তিক প্রতীক** (Liminal symbol) বলা হয়। লালের এই প্রেক্ষাপট দিয়ে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কীভাবে প্রতীকগুলো সভ্যতার **নীরব স্থপতি** (Silent architects) হিসেবে কাজ করে এবং আমাদের মূল্যবোধ, সামাজিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক কাঠামো গঠন করে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে লাল: অর্থের প্রথম ভাষা (Red in Prehistory: The First Language of Meaning)

সৃজনশীল বা অর্থপূর্ণ প্রতীক হিসেবে লালের গুরুত্ব প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বিদ্যমান। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রাচীন মানুষেরা ওয়েলস (প্যাভিল্যান্ড), ইসরায়েল (কাফজেহ) এবং অস্ট্রেলিয়ার (লেক মুঙ্গো) মতো অঞ্চলে **অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা সমাধি** (Burial practices) দেওয়ার সময় লাল গেরুয়া মাটি (Red ochre) ব্যবহার করত। মৃতদেহগুলোকে প্রায়শই লাল রঞ্জক দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হতো, যা একটি সুনির্দিষ্ট **আচারগত উদ্দেশ্য** (Ritual intent) নির্দেশ করে।

এই ব্যাপক অনুশীলনটি ইঙ্গিত দেয় যে, লাল রং রক্ত, **জীবন-শক্তি** (Life-force) এবং **পুনর্জন্মের** (Regeneration) প্রতীক ছিল। মৃত্যু তখন কেবল শেষ হিসেবে গণ্য হতো না, বরং একে একটি রূপান্তর বা সম্ভাব্য পুনর্জন্ম হিসেবে দেখা হতো। সুতরাং, আদিম সমাজেও লালের মতো প্রতীকগুলো মানুষকে তাদের **অস্তিত্ববাদী প্রশ্নগুলোর** (Existential questions) উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল।

ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজ যেমন যুক্তি দিয়েছিলেন, সংস্কৃতি হলো "প্রতীকী আকারে প্রকাশ করা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধারণার একটি পদ্ধতি।" তাই লাল ছিল সেই আদিমতম হাতিয়ারগুলোর মধ্যে একটি, যার মাধ্যমে মানুষ প্রথম তাদের **বাস্তবতা** (Reality) এবং জীবনের অর্থ নির্মাণ করতে শুরু করেছিল।

প্রান্তিকতা: রূপান্তরের চিহ্ন হিসেবে লাল

ভিক্টর টার্নার প্রবর্তিত **'প্রান্তিকতা'** (Liminality) ধারণাটি লালের প্রতীকী ভূমিকা বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'প্রান্তিকতা' বলতে বোঝায় সেই সন্ধিক্ষণ বা **উত্তরণকালীন পর্যায়কে** (Threshold phases), যখন কোনো ব্যক্তি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পদার্পণ করে—যেমন জন্ম, বয়ঃসন্ধি, বিবাহ বা মৃত্যু।

লাল বর্ণটি প্রায়ই এই ধরনের প্রেক্ষাপটে উপস্থিত থাকে:

- জন্ম এবং **প্রজনন ক্ষমতা** (Fertility) সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানে।
- দীক্ষা বা **অভিষেক অনুষ্ঠানে** (Initiation ceremonies)।

- অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা **শবাধার রীতিতে** (Funeral rites)।

এটি বিপদ এবং সম্ভাবনা—উভয়েরই প্রতীক, যা মূলত **রূপান্তরকে** (Transformation) মূর্ত করে তোলে। ভারতীয় সমাজে বিবাহে লালের ব্যবহার (যেমন- সিঁদুর, বিয়ের বেনারসি) একটি নতুন সামাজিক ভূমিকায় প্রবেশের রূপান্তরকে চিহ্নিত করে। একইভাবে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় লালের ব্যবহার জীবন থেকে **পরলোক বা পরজন্মের** (Afterlife) পথে যাত্রার প্রতিফলন ঘটায়।

সুতরাং, লাল হয়ে ওঠে রূপান্তরের এক দৃশ্যমান ভাষা, যা মানুষের জীবনের অনিশ্চিত অথচ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলোকে চিহ্নিত করে।

দেহ, রক্ত এবং আচার: নৈতিক ও সামাজিক মাত্রা

- রক্তের সাথে লালের গভীর সম্পর্ক একে মানবদেহ এবং জৈবিক প্রক্রিয়ার (যেমন- ঋতুস্রাব, সন্তান প্রসব এবং আঘাত) সাথে যুক্ত করে। ঐতিহাসিকভাবে এই প্রক্রিয়াগুলোকে আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি **প্রতীকী অর্থ** (Symbolic meaning) প্রদান করা হয়েছে।
- নৃতাত্ত্বিক ক্যামিলা পাওয়ার একে **'যৌথ আচারের প্রযুক্তি'** (Technology of collective ritual) হিসেবে বর্ণনা করেছেন—এটি এমন এক ব্যবস্থা যা আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান বা আইন গড়ে ওঠার অনেক আগেই মানুষের আচরণকে রূপ দিয়েছিল। আচার বিশেষজ্ঞরা প্রায়ই **পবিত্র** (Sacred) এবং **অপবিত্রের** (Profane) সীমানায় থেকে এই অনুশীলনগুলো পরিচালনা করতেন।

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে:

- এই ধরনের আচারগুলো একটি **অংশীদারিত্বমূলক নৈতিক কাঠামো** (Shared moral frameworks) তৈরি করেছিল।
- এগুলো কোনো জোরজবরদস্তি ছাড়াই **সামাজিক শৃঙ্খলা** (Social discipline) নিশ্চিত করেছিল।
- এগুলো পবিত্রতা, ত্যাগ এবং **কর্তব্যবোধের** (Duty) ধারণাকে সুসংহত করেছিল।

ভারতে **'ধর্ম'** (Dharma) এবং **'কর্ম'** (Karma)-র মতো ধারণাগুলো একইভাবে প্রতীকী ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে যা মানুষের নৈতিক আচরণকে পরিচালিত করে। এটি প্রমাণ করে যে, প্রতীকবাদ আনুষ্ঠানিক আইনের অনেক আগেই বিদ্যমান ছিল।

লিঙ্গ, ক্ষমতা এবং প্রতীকবাদ

লালের প্রতীকী তাৎপর্য লিঙ্গীয় ভূমিকা এবং **সামাজিক স্তরবিন্যাসের** (Social hierarchies) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যদিও লাল বর্ণটি প্রায়ই নারীদেহের জৈবিক প্রক্রিয়ার (প্রজনন, ঋতুস্রাব) প্রতিনিধিত্ব করে, তবে এর আচারিক নিয়ন্ত্রণ প্রায়শই বিশেষজ্ঞ বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হাতে থেকেছে।

অনেক সংস্কৃতিতে:

- নারীরা প্রজনন এবং বিবাহের আচারে লাল ব্যবহার করেন।
- আচারিক কর্তৃত্ব সামাজিক কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এটি প্রতিফলিত করে যে কীভাবে প্রতীকগুলো **ক্ষমতার সম্পর্কের** (Power relations) মধ্যে নিহিত থাকে। ভারতীয় সমাজে, লাল একদিকে যেমন **মাঙ্গলিক বা শুভত্বের** (Auspiciousness) প্রতীক (বিবাহ), অন্যদিকে এটি ত্যাগেরও প্রতীক (দেবী সাধনা ও বলিদান)। এটি লালের দ্বৈত নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রাকেই ফুটিয়ে তোলে।

প্রতীক এবং সামাজিক সংহতি: ডারখাইমীয় দৃষ্টিভঙ্গি

প্রতীকগুলো কেবল ব্যক্তিগত নির্মাণ নয়; এগুলো **যৌথ শক্তি** (Collective forces)। এমিল ডারখাইম জোর দিয়েছিলেন যে, আচার-অনুষ্ঠানগুলো সমাজের **যৌথ চেতনাকে** (Collective conscience)—অর্থাৎ সমাজের সাধারণ বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে।

ভারতে এর প্রতিফলন:

- দীপাবলির মতো উৎসব (অন্ধকারের ওপর আলোর জয়)।
- হোলি বা দোল উৎসব (লাল আবির, নবায়ন এবং **সামাজিক সমতা** (Equality))।
- জাতীয় প্রতীক যেমন—জাতীয় পতাকা (তিলক বা গেরুয়া সদৃশ রং) এবং **অশোক চক্র**।

এই প্রতীকগুলো ঐক্য, একাত্মতা এবং **আবেগীয় সংহতি** (Emotional integration) বৃদ্ধি করে। সুতরাং, লালের মতো প্রতীকগুলো কেবল নিষ্ক্রিয় বস্তু নয়—এগুলো সক্রিয়ভাবে সম্প্রদায়কে একত্রিত করে, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং **সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা** (Cultural continuity) বজায় রাখে।

অর্থনৈতিক মাত্রা: বাজারের আগের প্রতীক

- প্রতীকগুলো আদিম অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও রূপ দিয়েছিল। গেরুয়া মাটির (Ochre) দূরপাল্লার বাণিজ্য নির্দেশ করে যে, এর মূল্য কেবল বস্তুগত ছিল না, বরং ছিল **প্রতীকী মূল্য** (Symbolic value)।
- মার্সেল মাউস তাঁর 'উপহার বিনিময়' তত্ত্বে যুক্তি দিয়েছেন যে, বস্তু সামাজিক মূল্য বহন করে এবং **পারস্পরিক বিনিময়ের নেটওয়ার্ক** (Networks of reciprocity) তৈরি করে। একইভাবে ডেভিড গ্রেবার উল্লেখ করেছেন যে, আনুষ্ঠানিক বাজার ব্যবস্থার অনেক আগেই মূল্যের প্রতীকী ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীন ভারতে:

- আচারগত উৎসর্গ এবং বলিদান ছিল বিনিময় প্রথার আদি রূপ।
- লাল বস্তুগুলো জীবন এবং **পবিত্র মূল্যের** (Sacred value) প্রতীক ছিল।

আজও অর্থনৈতিক আচরণ প্রতীকের দ্বারা প্রভাবিত:

- **ব্র্যান্ডিং** (Branding) এবং সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য ভোগ।
- উৎসব ও বিয়েতে উপহার আদান-প্রদান।

এইভাবে, প্রতীক অর্থনীতি এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সেতু বন্ধন করে, যা নির্ধারণ করে কীভাবে আমরা কোনো বস্তুর মূল্য অনুভব করি।

লালের বিশ্বজনীনতা

লালের প্রতীকী তাৎপর্য ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত:

- **চীন:** সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের প্রতীক।
- **মিশর:** জীবন এবং বিশৃঙ্খলার (Chaos) প্রতীক।
- **গ্রীক সাহিত্য:** আবেগীয় গভীরতা (যেমন হোমারের 'wine-dark sea')।
- **হিব্রু ঐতিহ্য:** মাটি (আদামা) এবং মানুষের (আদম) মধ্যে যোগসূত্র।

ভারতে লালের রূপ:

- **সিঁদুর ও কুমকুম:** বিবাহ এবং প্রজনন ক্ষমতার চিহ্ন।
- **উৎসবে লাল:** শক্তি এবং **নবায়নের** (Renewal) প্রতীক।
- **দেবী পূজায় লাল:** ক্ষমতা, তেজ এবং ত্যাগের প্রতিফলন।

এই বিশ্বজনীনতা প্রমাণ করে যে, লাল বর্ণটি ধারাবাহিকভাবে মানুষের জীবনের রূপান্তরকে চিহ্নিত করে।

দার্শনিক মাত্রা: লাল এবং মানবিক অভিজ্ঞতা

জোহান উলফগ্যাং ফন গ্যাটে লালের দার্শনিক গুরুত্ব অন্বেষণ করেছেন। তিনি লালকে আলো ও অন্ধকারের মাঝে অবস্থিত সবচেয়ে **তীব্র এবং তাৎক্ষণিক রং** (Intense and immediate colour) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

লাল হলো:

- বিমূর্ত ধারণার চেয়ে অনেক বেশি **আবেগপ্রবণ** (Emotional)।
- শারীরিক হওয়া সত্ত্বেও গভীর **প্রতীকী** (Symbolic)।

এটি ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত রূপ, যা বস্তুগত জগতের সাথে **অধিবিদ্যক** (Metaphysical) জগতের সংযোগ ঘটায়।

আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা: পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রতীক

সমসাময়িক যুগে প্রতীকের বিবর্তন ঘটছে:

- ডিজিটাল প্রতীক (মিম, হ্যাশট্যাগ) সামাজিক আলোচনাকে রূপ দিচ্ছে।
- প্রচলিত অর্থগুলোর নতুন ব্যাখ্যা তৈরি হচ্ছে।
- **পরিচয় রাজনীতি** (Identity politics) প্রায়শই প্রতীকী চিহ্নের ওপর ভিত্তি করে আবর্তিত হয়।

ইউভাল নোয়াহ হারারি যুক্তি দেন যে, ধর্ম, জাতি বা অর্থের মতো **অংশীদারিত্বমূলক প্রতীকী ব্যবস্থার** (Shared symbolic systems) কারণেই বড় মাপের মানবিক সহযোগিতা সম্ভব হয়েছে। তবে প্রতীক বিভাজনও তৈরি করতে পারে, তাই নৈতিকভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে প্রতীক যেন বর্জনের বদলে **অন্তর্ভুক্তিকে** (Inclusion) উৎসাহিত করে।

উপসংহার

লালের গল্পটি আসলে মানুষের **চেতনারই** (Human consciousness) গল্প। প্রাগৈতিহাসিক সমাধি থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজের প্রাণবন্ত আচার-অনুষ্ঠান পর্যন্ত—লাল কেবল মানুষের জীবনকে সঙ্গ দেয়নি, বরং তাকে ব্যাখ্যা করেছে। এটি জন্মকে আশায়, মৃত্যুকে ধারাবাহিকতায় এবং ত্যাগকে নবায়নে রূপান্তরিত করে।

প্রতীকগুলো সংস্কৃতির নিষ্ক্রিয় প্রতিফলন নয়; তারা **বাস্তবতার সক্রিয় স্রষ্টা** (Active creators of reality)। এগুলো আমাদের বিশ্ব দেখার দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে এবং আমাদের নৈতিক পছন্দগুলোকে পরিচালিত করে। এদের অনুপস্থিতিতে সভ্যতা কেবল তার সংহতিই নয়, বরং তার **আত্মা** (Soul) হারাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, *'একটি দেশ কেবল একখণ্ড মাটি নয়; এটি মানুষের মনের প্রকাশ।'* আচার, আখ্যান এবং **যৌথ স্মৃতির** (Collective memory) মধ্যে নিহিত প্রতীকের মাধ্যমেই এই 'মন' প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিজেকে প্রকাশ করে।

তাই লাল কেবল একটি রং নয়; এটি বস্তুগত ও অধিবিদ্যক, ব্যক্তিগত ও যৌথ এবং সসীম ও অসীমের মধ্যে এক **দার্শনিক সেতু** (Philosophical bridge)। যতদিন মানুষ তার অস্তিত্বের অর্থ খুঁজবে, ততদিন প্রতীকগুলো সভ্যতার **নীরব স্থপতি** (Silent architects) হিসেবে আমাদের জীবনের প্রতিটি মোড়ে গভীরতা ও মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকবে।

Q. "Symbols are the silent architects of civilization; they build what laws can only regulate."

***